ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 624-632
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.051

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্প: আটপৌরে লৌকিক জীবনের ইতিবৃত্ত

বাবলী বর্মন, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.01.2025; Accepted: 19.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Subrata Mukhopadhyay (1950–2020), a distinguished writer, emerged as a prominent literary figure of the 1970s. His works adeptly depict the political landscape of Bengal in the seventies, eighties, and nineties of the 20th century, addressing issues such as land and agriculture, the deprivation of common people, the struggles of marginalized lower classes, and the vibrant yet challenging lives of rural folk. He skillfully portrays the essence of life in his works, capturing the complexities of everyday existence with remarkable depth. Additionally, he highlights the spiritual resilience of the unwavering Brahmin community.

Mukhopadhyay's literature gives artistic expression to the eternal beauty of human civilization, emphasizing human integrity above all else in an effort to uncover the profound beauty of the human heart. Through his narratives, he vividly illustrates the hardships of the rural lower class, portraying their crises, daily struggles, and social challenges. His stories explore themes of boundless heroism and resilience among those without physical or financial support, including the disabled, blind, crippled, lepers, and beggars. Moreover, his short stories intricately weave the perpetual relationship between humans and nature.

This article aims to examine the artistic beauty embedded in the inner lives of the poor and needy in rural areas, as well as the seamless blend of worldly experiences in Mukhopadhyay's storytelling. By analyzing selected short stories such as Badyakar, Vishahar, Kakcharitra, Shaman, and Kuthobabara Chaillen, this study seeks to explore the depth and engagement of his literary illustrations.

Keywords: Subrata Mukhopadhyay, Short story, Rural Folksy, Bengali literature, Marginalized lower classes.

বিশ শতকের সাতের দশকের কথাশিল্পী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জুন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষজনের টিকে থাকার যে আপ্রাণ সংগ্রাম তার চিত্র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ফুটে উঠেছে। তাঁর জন্মস্থান যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের একটি

ঐতিহাসিক স্থানে উত্তর চব্বিশ পরগণার হালিশহরের কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়ায় সেখানে সাধক ও কবি রামপ্রসাদ সেনের (১৭২০-১৭৮১) জন্ম ও তিরোধান, রানী রাসমণি দেবীর জন্মস্থান, চৈতন্য পার্ষদ শিবানন্দ সেনের জন্মভূমি এই মাটিতে কথাসাহিত্যিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ও শৈশবে লালিত হওয়া, তাই নিজের জন্মস্থানের অতীত গৌরবময় সময়কালের লুপ্ত ইতিহাস ও সঙ্গে একজন শিল্পীর আর একজন শিল্পীকে অনুসন্ধান ও বুঝতে চাওয়ার যে চেষ্টা তা তাঁর রচনাবলীতে লক্ষণীয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বসে অষ্টাদশ শতকের একজন বিরল প্রতিভাধর কবি সাধক রামপ্রসাদকে নিয়ে তিনি 'যে দেশেতে রজনী নাই' ছোটোগল্প এবং 'আয় মন বেড়াতে যাবি (১৯১০) উপন্যাস লিখেছেন। রচনা করেছেন একাধিক উপন্যাস- পৌর্ণমাসী' (১৯৮৪), 'রসিক' (১৯৯১), 'আয় মন বেড়াতে যাবি' (২০১০), 'বীরাসন' (২০০৯), 'চন্দনপিঁড়ি' (২০১৫) ইত্যাদি। তিনি বিশ শতকের সাতের দশক থেকে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর প্রতিনিয়ত সাহিত্য রচনা অনুশীলন করে গিয়েছেন। ১৬ই মার্চ, ২০২০ সালে কলকাতার সোনারপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই সময়কালে তিনি কুড়িটির অধিক উপন্যাস এবং প্রায় দুইশত ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই প্রান্তিক নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের বেঁচে থাকার লড়াই থেকে শুরু করে সমাজের হীন মানসিকতা, নারী নির্যাতন, রাজনৈতিক শোষণ, ধর্ষণ, তন্ত্র সাধনার সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ের বিচিত্রতা ও শৈল্পিক রূপের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। প্রতিটি লেখার মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিবারই জীবনকে এক এক ভাবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন। এই গভীর জীবনবোধ থেকে উৎসারিত এক দৃষ্টি দিয়ে অবহেলিত সমাজ এবং নির্মোহ ভঙ্গিতে মানুষের জীবনযাত্রার হুবহু রূপকে তিনি তাঁর লেখনীতে স্থান দিয়েছেন। তাই তাঁর ছোটোগল্পগুলি এতটা অভিনব ভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি ছোটোগল্পের মধ্য দিয়ে তিনি শৈল্পিক রূপের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এক ভিন্ন মাত্রার সাহিত্য সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর এই বিশিষ্ট জীবন ভাবনা ও শিল্পকৌশলে সমৃদ্ধ গল্পগ্রন্থগুলি হল – যে দেশেতে রজনী নাই (১৯৯০), আব্দুল-রহিমা (১৯৯০), সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (২০০৪), সেরা ৫০টি গল্প (২০১২), দশটি গল্প (২০০৮), চরমপত্র (১৯৮৮), পাতার বাঁশি (২০০১) ইত্যাদি।

'বাদ্যকর' গল্পটির নায়ক ইলামবাজারের বাদ্যকর শ্রীপতি মাষ্টার। বাদ্যকর শ্রীপতি মাষ্টারের আহ্বান আসে সুদূর পলাশীর রসা স্টেশনের নিকটবর্তী রুক্ষ, শুষ্ক ডোম পাড়ার লাগোয়া গ্রাম পেঁচালিয়ার বাদ্যকরদের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ঢোলক, সানাই, কাঁসি, হারমোনিয়াম, বাঁশি শেখানোর জন্য। পেঁচালিয়ার বাদ্যকরদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শ্রীপতি বাজনা শেখাতে গিয়ে তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার জীবনের গুরুত্ব যে কতটা মূল্যবান তা এই আপনজন স্বরূপ মানুষগুলির কাছে আন্তরকিতায় অনুভব করে। লেখক শ্রীপতির নিজ কর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা এবং নিপুণ কর্মপ্রিয় এই মানুষটির শিল্পের প্রতি রক্তবাহিত এক নাড়ির টানের প্রকৃতি প্রদত্ত স্বভাবকে মিলিয়ে দিয়েছেন প্রকৃতির সহজতার সঙ্গে –

> "মাঝখানে দুটি বৎসর। খরায়-বানে দেশ কাতর ছিল বলে ডাক পড়েনি। এবার রুখোশুখো হলেও রসাতলে নামেনি। তাই ইলামবাজারের শ্রীপতি বাদ্যকরের ডাক পড়েছে আবার। ডাক গিয়েছে এখখানা পোস্টকার্টে- এসো হে মাস্টার, আমরা বাজনা পেড়েছি।- বিস্তর বাক্য না থাকলেও এ তলবের তলে তলে টান ছিল। অনেকটা সেই প্রবল গ্রীষ্মে শাল-নদীর তলাকার লুকোছাপা জলের মতন। বালি আঁচড়ালেই সরল কাচ জল। শীতলে জীবন জুড়ায়।"[১]

বাদ্যকরদের সভা মহলে শ্রীপতি মাষ্টার কত বড় একজন মহাত্মা, যিনি পেঁচালিয়ার বাদ্যকরদের জীবনের রুজি রোজগারের অন্নদতা একজন মানুষ, যার আগমনে নিরন্ন মানুষগুলির অন্নের যোগান হবে আর তারসঙ্গে আনন্দমেলায় সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া যেন আর এক উপরি পাওনা। এই নিরন্ন মানুষগুলির সঙ্গে শ্রীপতির যোগসূত্র রয়েছে বাঁশির সুরেই সে যদি মাঠের প্রান্তে ক্ল্যারিওনেট বাঁশিতে যাত্রা পথের হদিস জানতে চায় তাহলে ওপার থেকে করনেট বাঁশিতে আওয়াজ ফিরবে "এসো হে প্রাণ সখা তুমার চরণ দেইখতে সাধ মনে।"[২] এভাবে কুশল বিনিময়ের জন্য একে অপরের হৃদয় যে এক সুতোয় বাঁধা, এক অদৃশ্য বন্ধন শ্রীপতি উপলব্ধি করে। শ্রীপতির সুর শিক্ষা দানের মাধ্যমেই ঘটবে অনেকেরই প্রাণ–

> "মাস্টার তাদের সুর দেবে, তারা সেই সুর সিখে উঠবে গিয়ে আর পাঁচজনের আঙিনায়, আনন্দমেলায়। মাঝখানে পেটপূরণের জন্য মিলবে কিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা। কিঞ্চিৎ না কোরো বঞ্চিত।"[৩]

পেঁচালিয়া যেতেই মেঠো পথেই ভুলো লাগার এক মাঠে শ্রীপতির সাক্ষাৎ ঘটে মনসার সঙ্গে। যে কিনা ঘরছাড়া এক ভুলো মেয়ে যার মাথার কোন ঠিক নেই। এই মনসাই শ্রীপতি মাষ্টারকে পেঁচালিয়া নিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে মাঠের পথ দেখিয়ে। দশজনের দৃষ্টিতে মনসা পাগলি যার মাথার ঠিক নেই, সে কিন্তু প্রকৃতির রূপ দেখার জন্য চাতক পাখির মত মুখিয়ে থাকে ঘরে যার মন বসে না। মনসার উক্তিতে – "আমি আমার মতন থাকি, দুনিয়াটো দেখি। কিন্তু দিনটো ঝপ্ করি শ্যাঁষ হঁইন যায়। রাতটো যেন জুঁরুই থাকে জলের পারা। হঁ গো, আমি কুছুই জানি না। ঠার করে থাকি রেতের বেলা। কে জানে বাপু কার মুনে কি আছে।"[৪] এরপর পেঁচালিয়ায় মনসার সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে শ্রীপতি নিজেদের মধ্যে এক অজানা টান যেন অনুভব করে। যদিও পরের দিন নিজের কর্ম পটুতা শিখিয়ে দিয়ে শ্রীপতি পেঁচালিয়া ত্যাগ করে। গল্পের শেষে দেখি দুই বছর পরে শ্রীপতি আবার পেঁচালিয়া যাত্রা করে বাজনা শেখাতে কিন্তু সেবারে আর কোন ভুলোর সাথে সাক্ষাৎ হয়না এমনকি গন্তব্যে পৌঁছেও আর মনসাকে দেখতে পায় না। এবারে মনসা অন্যরূপে শ্রীপতি মাষ্টারের সামনে আসে সুস্থ এক গৃহবধূর বেশে ঘোমটা টেনে পরিপাটী চায়ের প্লেট হাতে। যাকে দেখে শ্রীপতি চমকে ওঠে এই ভেবে যে ভুলো পথের মনসাকে কি এই পরিবেশে মানায়? দুপুরে এক আকাশ রোদ মাথায় করে শ্রীপতি এবারে ফিরছিল কিন্তু এবারে হাজার মাথা খুঁড়লেও যে সেই ভুলকো তারাটিকে আর দেখা যাবে না। তাই শ্রীপতি বাদ্যকরের জীবন থেকে তার নিজের মত আরও একজন যে উদাসী খেয়ালিপনা মানুষ আছে তা এরপর মুছে যাবে। গল্পটিতে লেখক এক অক্ষরজ্ঞানহীন বাদ্যকরের জীবনের অন্তরের শিল্পসৌন্দর্যকে প্রস্ফুটিত করেছেন। যার নিম্নবৃত সংসারে রুজি রোজগার করে সংসার চালনা করার মত পরিবেশ থাকলেও তার নিজের ভালোলাগার সূত্রে শিল্পের প্রতি এক অদৃশ্য হৃদয়ের টানে সে ভাইকে বাড়িতে দোকান পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সুদূর পেঁচালিয়া যাত্রা করে অনেক খানা খন্দ মাঠ ঘাট পেরিয়ে। নিজের অন্তরের রক্তবাহিত এক টান রয়েছে শ্রীপতি বাদ্যকরের শিল্পের প্রতি। যার ফলে সে নিজেও মনসার মত একজন আউল বাউল নারীর মধ্যেও নিজের ভাবের আদান প্রদান করতে পারে। হৃদয়ের টান অনুভব করে মেয়েটির প্রতি এবং তার সঙ্গে রাত্রিকালেও কুশল বিনিময় করে পথ চিনে পেঁচালিয়া গ্রামে পৌঁছোতে পারে। এরকম এক আপনভোলা উদাসী নিপুণ কর্মপটু শ্রীপতি বাদ্যকর দু'বছর পরে পেঁচালিয়া এসে হৃদয়ের গোপনে লুক্কায়িত বাসনা যে ভুলো পথের মনসাকে দেখতে পাবে নিজ ভাবের পরিসরে, কিন্তু মনসা তখন তার স্বামীর ঘরের ঘরণী সুস্থ স্বাভাবিক এক রমণী। তার স্বামী তাকে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে সুস্থ হওয়ায়। এভাবে

তিনি প্রকৃতির বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে মানবসত্তার অন্তরস্থিত সততাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই কর্মনিপুণ শৈল্পিক মনভাবাপন্ন মানুষটি যেন আমাদের থেকেও অনেকটা উর্দ্ধে অবস্থান করেছে। কুটিলতা, জটিলতা, চক্রান্ত, দুর্নীতি ইত্যাদির থেকে শত হস্ত দূরে এই প্রান্তিক মানুষগুলির মধ্যে সুব্রত মুখোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন আদর্শ ভারতবর্ষের চিত্রাবলী। আধুনিকতার থেকে দূরে বাস করলেও যে তারাই সত্যিকারের অর্থে আধুনিক মানব তা আমরা গল্পটি পাঠ করলে উপলব্ধি করি। তারা অন্ধকারেও নিজেদের অন্তরের প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রেখেছে এবং সকলের মধ্যে সেই আলো ছড়িয়ে দিয়ে প্রকৃত সেবা করছে। জগতের আনন্দমেলায় যে সবারই নিমন্ত্রন তা শ্রীপতি, সৃষ্টিধর, মনসা, সুবল, অধর, মহাদেব, নরেনদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতায় বিচ্ছুরিত হয়েছে গল্পটিতে।

'বিষহর' গল্পটি গ্রামের এক সাপুড়ে শিবনাথ হালদার ও অক্ষয় সান্যালকে ঘিরে সাপুড়েদের সাপ ধরা জাতব্যাবসা এবং সঙ্গে সাপ সম্পর্কে গ্রামীণ বিভিন্ন ট্যাবুকে দেখানো হয়েছে। গল্পের শুরুতেই লেখক সাপের সঙ্গে পঙ্গু অক্ষয়ের তুলনা করেছেন চিতি সাপের সঙ্গে "এ চিতি নড়তে পারে না। নিজের বিষে নিজেই জর জর।"[৫] শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ অক্ষয় তার স্ত্রী পদ্মের সঙ্গে প্রতিবেশী সাপুড়ে হালদারের গোপন সম্পর্কের সন্দেহের বিষে আবিল। তাই সে হালাদারকে দুচক্ষে সইতে পারে না। অথচ দুজনেই ছোটবেলার বন্ধু পাশাপাশি দুটি লাগোয়া ঘরে অবস্থান করে। সাপুড়ে ওস্তাদ হালদার যে সাপ ধরতে পটু সে কোন এক অলৌকিক ক্ষমতাবলে বলতে পারে কার বাড়িতে কোন জাত সাপ লুকিয়ে আছে, কার বাড়িতে বেজোড় সাপ সঙ্গী হারিয়ে একা রয়েছে। হালদার নিজের পেটের মধ্যে সাপ রেখে নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়ায়। অক্ষয়ের বাড়িতে হালদার আসে তাদের গৃহে একটি গোখরো আছে তাকে না ধরে তার শান্তি নেই বলে। কিন্তু অক্ষয়ের পদ্মকে নিয়ে হালদারের কোন সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করে। তাই সে পদ্মকেও অনেক কটুবাক্য বলতে দ্বিধা করে না। সাপকে নিয়ে লৌকিক মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরেণের ট্যাবু রয়েছে তাকে দেখানো হয়েছে গল্পটিতে। বেচু পালেদের বাড়িতে আসা এক গুণিনের কথায়-

> "এ বাড়িতে দুটি চন্দ্রবোড়া ছিল। পুরুষটা পালিয়েছে এনাদের অনাচারে। তেনার গায়ে খারাপ জল ফেলা হয়েছে। সে এখন বনে বাদাড়ে নিঃশ্বাস ফেলে বেড়াচ্ছে আর তাতে এদের অকল্যান হচ্ছে।
> হালদার এক পা এগিয়ে এল _ আর মেয়েমানুষটি?
> _তেনাকেই ধরতেই তো এখেনে আসা। যে কোনদিন বাড়ির মানুষকে দংশন করতে পারে।"[৬]

এরপর গুণীন বেচু পালের বাড়ি থেকে এক চন্দ্রবোড়া সাপকে বের করে ধরে ঝাঁপিতে পুরে ফেলে। হালদার নিজে সাপ ধরে তাকে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন অক্ষয়ের ঘরেই এক গোখরো সাপ ঢুকে পরে। এইসময় পদ্ম আসে হালদারকে ডাকতে অক্ষয়ের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে। হালদার তাকে নির্দ্বিধায় পঙ্গু অক্ষয়ের মরণ কামনার কথা বলতেই পদ্ম হালদারের পায়ে পড়ে। যে স্বামী আজীবন পঙ্গু হয়ে শয্যাশয়ি এই স্বামীর প্রাণের মূল্য পদ্মের কাছে এতটা দামী তা যেন হালদারের দৃষ্টিকেও হতচকিত করে দেয়। পদ্ম হালদারের পা জড়িয়ে ধরে তার স্বমীর প্রাণ রক্ষার জন্য করুণ প্রার্থনা জানায়। হালদার যেন তার জীবনে এই প্রথম কোন নারীর পদসেবা পেল। সাপিনী স্বরূপ পদ্ম সাপুড়ে হালদারের পা পেঁচিয়ে ধরে কারো জীবনের মূল্যকে অন্যের কাছে যে এতটা দামি হতে পারে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। যার হাত থেকে হালদারের ছাড়া পাবার উপায় নেই। লেখকের কলমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে –

> "হালদার নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর চোখ বুজে পায়ের কাছে তার তপ্ত-ক্ষীর শরীরের ওম নিতে থাকে। এই নারী কিনা বিষ ঢালে। এখন যে মধুর ধারায় ধুয়ে যাচ্ছে, বহুকালের রুখোশুখো শরীরের বন্ধ শিরায় আবার রক্ত উছলে উঠছে। বিষ না অমৃত। কী করে একসঙ্গে একপাত্রে থাকে। আশ্চর্য!"[৭]

অক্ষয়ের উঠানে পা দিতেই হালদার বুঝতে পারে পঙ্গু চিতি অক্ষয়ের গোঙানি। গোখরো সাপের সম্মুখে নিজের প্রাণকে হারাতে দেখে পিশাচ স্বরূপ মরণভয় অক্ষয়কে আঁকড়ে ধরে। আধমরা অক্ষয় জীবনে কোন আলোর সন্ধান না পেলেও বেঁচে থাকতেই তার আনন্দ। জীবনকে বড় ভালবেসে ফেলেছে অক্ষয়। তাই বিকলাঙ্গ দেহ নিয়েও সে মরতে ভয় পায়। প্রাণ রক্ষা করতে বন্ধু হালদারের কাছে সে ভিক্ষা চায়। তাই এক প্রাণকে বাঁচাতে সাপুড়ে হালদারকে আর এক প্রাণের বিনাশ ঘটাতে হয়। এই প্রথম হালদারকেও মানুষের আর্তনাদের সামনে সাপকে মারতে হয়। সাপ সম্পর্কে গ্রাম্য সমাজে ট্যাবু রয়েছে যে সাপ আঘাত পেলে তাকে ছেড়ে দিলে সে তিন দিনের দিন আবার এসে আঘাতকারীর প্রাণ নেবে প্রতিশোধ স্বরূপ। তাই হালদারও অক্ষয়ের কথামত আঘাতপ্রাপ্ত সাপটিকে মেরে ফেলে। অন্যদিকে অক্ষয় সেই পুরনো খোলসেই জীবিত থেকে যায়। তার আর পুরনো জীর্ণ খোলস ছাড়ার ফুরসৎ হয় না। এভাবে ব্যঞ্জনার মাধ্যমে গল্পটি আমাদের জীবন সত্যকে পাঠ দেয়। এছাড়া গল্পটিতে লেখক গ্রামীণ পরিবেশের রূপ, উপমা, চিত্রকল্পের প্রয়োগ শিল্পীর নিপুণ তুলিতে চিত্রিত করেছেন। যেমন অন্ধকার বর্ষা প্রকৃতির রূপের বর্ণনা–

> "অন্ধকারেও বোঝা যায় বিলের এখানে ওখানে পানার ঝাকে নীল ফুলের থোকাগুলো থই থই আনন্দে হাসছে। ঝিঁ ঝিঁ আর ব্যাঙের ডাকে কান পাতা যায় না। নিরিবিলি বাদলা মাথায় করে বোলতার বুকে যেন কনসার্ট বসেছে, বাজনা বাজছে নানান সুরে। তার সঙ্গে ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি। ওধারে জলপাই গাছের মাথা থেকে সেই পাখিটা ডেকে ওঠে – কে জাগে। কে জাগে।"[৮]

'কাকচরিত্র' গল্পটিতে লেখক মেথর জ্ঞানীরামের নিম্নবৃত্ত সংসারের সামান্য রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ এবং তার আত্মদগ্ধ বিষাদময় জীবনের কথা দরদী শিল্পীর তুলিতে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানীরামের ক্ষুদ্র সংসারে মেয়ে চম্পাকে নিয়ে তার বাস। জ্ঞানীরাম তার কর্মময় জীবনে সময়ে অসময়ে লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়া আসা মেথরের কাজ করলেও তার জীবনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হল এক আকাশ শান্তির স্থান। তাই সে দৈনন্দিন কর্ম সেরে প্রতিরাত্রে তুলসীদাসকে পাঠ করে। তুলসীদাস তাকে সকল পথের হদিশ বলে দেন। জ্ঞানীরাম তাই তুলসীদাসকে তথা ভগবত পাঠ করে মানব জীবনের সত্যকে উপলিব্ধি করে। মানুষের চরিত্র সম্পর্কে তুলসীদাস একস্থানে বলেছেন – "যে জনমে কলিকাল করালা করতব বায়স বেষ মরালা। যে সব মানুষ এই কলিযুগে জন্মেছে, তাদের কর্মের ধারা হল কাকের মতন কিন্তু পোশাক আশাক মরালের।"[৯] একালের মানুষ সম্পর্কে উক্তিটির সত্যতা আমরা গল্পটিতে পাঠ করি। গল্পটিতে দেখি জ্ঞানী রামের সংসারে সে কোনমতে নিজের কর্ম করে সামান্য যা রোজগার করে তাতে তার সংসার চলে। সে দিনে সব্জির ঠেলা নিয়ে বাজারে সব্জি বিক্রি করে, রাত্রে মুর্দা ফরাসের কাজ করে। তার একমাত্র মেয়ে চম্পার সাত বছরে বিয়ে দেয় পঁয়ত্রিশ বছরের এক পাত্রের সঙ্গে কিন্তু যুবতী চম্পা সেই বৃদ্ধের সঙ্গে সংসার করতে নারাজ তাই সে শ্বশুরঘর ছেড়ে এসে বাপের কাছেই থাকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চম্পা তার নিজের চারিত্রিক সততা হারিয়ে মুখে পান, বাহারি সাজে ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে সিনেমা দেখে ও যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। এরপর একসময় কুমারী চম্পা অন্তসত্বা হওয়ায় সে ফাঁসী দিয়ে আত্মহত্যা করে পরম শান্তি লাভ

করে। জ্ঞানীরাম তার সকল দুঃখ তুলসীদাসের শ্রীচরণে অর্পন করে সকল যন্ত্রণা, বেদনা থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু একদিন এই মেয়ে চম্পা জ্ঞানীরামকে ঝড়বাদলের রাত্রে পিশাচ বেশে বা ভৌতিক পরিবেশে দেখা দেয়। সন্তানের এই অতৃপ্ত আত্মাকে বীভৎস বেশে প্রত্যক্ষ করে জ্ঞানীরাম নিজের অপরাধবোধ তথা পাপবোধে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। গল্পটিতে এক অসহায় পিতার আত্মগ্লানিকে নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। অর্থসংকটে কন্যাকে এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ, পিতার সন্তানের প্রতি কর্তব্যহীনতা এবং উত্তরাধিকারকে সুস্থ, স্বাভাবিক পরিবেশ দিতে না পারার যে তিল তিল যন্ত্রণা তা জ্ঞানীরাম চরিত্রটিতে লেখক ক্রমান্বয়ে ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা দেখিয়েছেন।

'শমন' গল্পটিতে অন্ধকার রাজবংশীর জীবনে অভাব-অনটনে পূর্ণ এক নিম্নবর্গ পরিবারে উচ্চবৃত্তের দ্বারা সামাজিক এবং আর্থিক শোষণের কথা বর্ণিত হয়েছে। অন্ধকার রাজবংশীর ঘরে যমদূত স্বরূপ সরকারি পেয়াদা কৃষ্ণচন্দ্রের খাজনার তাগিদে আগমন এবং তাকে নিজেদের মুখের গ্রাসের অর্ধেক ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে বিদেয় করার চিত্র দেখানো হয়েছে। অন্ধকারের পরিবারের অন্ধকার দিবারাত্রির প্রাণীগুলির হা অন্ন হা অন্ন প্রতিধনির পরিবেশে পেয়াদাকে নিজেদের ক্ষুধার অর্ধেক ভাগ দিয়ে বিদায় করার মাধ্যমে উচ্চবর্গের মানুষের দ্বারা শোষিত এক নিম্নবর্গের মানুষের জীবনকে লেখক তুলে ধরে দেখিয়েছেন সামাজিক শোষণের চিরাচরিত বাস্তব রূপকে। গ্রামীণ নিরক্ষর মানুষগুলিকে ভয় দেখিয়ে, প্রতারণা করে, ছলে বলে কৌশলে টাকার জালে ফাঁসিয়ে জোর জবরদস্তি করে অর্থ-সামগ্রী লুঠের চিত্র গল্পটিতে দেখানো হয়েছে। সরকারি পেয়াদা কৃষ্ণচন্দ্র অন্ধকারের ক্রোকের টাকার আদায় করতে আসে অন্ধকারের নিকট। সরকারি লোনের টাকা পাঁচ বছরে অন্ধকার কেবল পঁচিশ টাকা শোধ করতে পেরেছে, সুদে আসলে সেই টাকা বেড়ে পরবর্তীতে দ্বিগুণ হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র টাকা চাইতে এসে অন্ধকারের কাছে জানতে পারে তার পঁচাত্তর টাকার লোন হিসেবের খাতায় দুশো পঁচিশ টাকা লেখা হয়েছে। উপরন্তু অন্ধকারের কেনা ষাঁড় প্রধানের বাপের শ্রাদ্ধে লাগে –"আজ্ঞে বেরষো উচ্ছুগণ্ড করলেন কিনা। ষাঁড়ের ন্যাজ ধরে তেনার পিতা সগ্যে গেলেন।"[১০] এভাবে সমাজের উচ্চবৃত্ত মানুষ এবং সরকারি কর্মচারী ব্যক্তিদের দ্বারা শোষিত এক চালচুলোহীন হতদরিদ্র পরিবারের চিত্র গল্পটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

'কুঠোবাবারা চইললেন' গল্পে সমাজ বিচ্ছিন্ন কুষ্ঠরোগীদের অবস্থান দেখানো হয়েছে। সুস্থ মানুষদের সঙ্গে কুষ্ঠরোগীদের ভিন্ন জীবন যাপন চিত্র এবং হিন্দু-মুসলমানের আত্মিক সম্পর্ক পীর নিমচাঁদের মেলার মিলনক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। দেদার বকস এবং নূর মহম্মদ দুজন কুষ্ঠরোগী নিমচাঁদের মেলার প্রাঙ্গণে আসে। মেলার পরিবেশে এসে এক বৃদ্ধ স্বামীর স্ত্রী তরাসীর সঙ্গে নূর মহম্মদের কথোপকথনে লেখক কুষ্ঠরোগীরাও যে মানুষ তা দেখিয়েছেন। তরাসী নূর মহম্মদকে তাদের পেশার কথা জানতে চাইলে সে প্রথমেই বলে "নূর ঝপ করে বলে ফেলে – আমরা তো মানুষ"[১১] এরপর নূর মহম্মদ বৃদ্ধ বৈরাগীর তরুণী স্ত্রী তরাসীর প্রতি তার প্রেমিক সত্তার স্বাভাবিক প্রণয় অনুভব করে, সেও তরাসীকে পছন্দ করে তাই তরাসীর সঙ্গে কয়েক দণ্ড কথা বলে সে শান্তি উপভোগ করে। নূরকেও একসময় প্রসঙ্গক্রমে বলতে দেখা যায়– "আমরা জোনাই, চাম সবাইকে তো পাখি সমঝি।"[১২] এভাবে লেখক মিলিয়ে দিয়েছে স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে কুষ্ঠরোগীদের জীবনকে। তারাও জীবনকে উপভোগ করতে চায়, স্বাভাবিক স্রোতে মিশতে চায়। সকলের মধ্যেই যে মনুষ্যরূপী ঈশ্বরের বাস তা আমরা গল্পটি পাঠে উপলব্ধি করি। এছাড়া লেখক মিলিয়ে দিয়েছেন বৃহত্তর প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একত্রে মিলিত হওয়ার পরিবেশকে নিমচাঁদের মেলার প্রাঙ্গণে।

বর্ণিত হয়েছে পীর বা দরবেশ রূপী নিমচাঁদের বীরত্বের কথা, পীরের তসবি ছেড়ে অসি ধরার চিত্র, লৌকিক মানুষদের জীবনে পার্বণ বা উৎসবের চিত্র, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মেলার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে সকলের মিলিত হওয়ার বা আহ্বানে সকলের সাড়া দেওয়ার মত প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতাকে। একান্তই নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী এই পীরের মেলা। এই দরবেশ অথবা পীরের মেলায় বিশাল প্রান্তরে খোলা মাঠে প্রকৃতির উন্মুক্ত এক আকাশের নীচে সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণের একত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চিত্র বর্ণিত হয়েছে –

> "কথা আছে, পীর নিমচাঁদ যখন রাজার সঙ্গে তরবারি লয়ে ধর্মযুদ্ধে গমন করেন তাঁর সম্মুখে হাজার হাজার বর্গী।... এ অত্যাচার দমন করতে পারেন না একা রাজা শিবরাম, তাই শরণ লন পীর নিমচাঁদের যিনি তাঁর দোস্ত-বন্ধু আবার অন্তরের গুরুও বটেন।... এই সেই মাঠ। এখন খাঁ খাঁ তেপান্তর না, মেলার শোরে তাল বেতাল হট্টগোল। দোকানপাট মানুষজন, চোঙার গান সব নিয়ে যাকে বলে এলাহি কারবার।"[১৩]

এই উন্মুক্ত পরিবেশে মেলার প্রাঙ্গনে এসে লেখকও ভিন্ন পথযাত্রী বিকলাঙ্গ কুষ্ঠরোগীদেরকে মিলিয়ে দিয়েছেন সমাজের স্বাভাবিক স্রোতে। ব্যাক্ত করেছেন সুস্থ মানুষদের মত তাদের চাওয়া পাওয়া এবং বেঁচে থেকে স্বাভাবিক মানুষরূপে দিনযাপনের মনোবাসনাকে। সর্বোপরি লেখক প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক যে সংযোগ তা গ্রামীণ লৌকিক মানুষদের জীবনযাপন এবং তাদের প্রতিদিনের জীবনস্রোতকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তুলে এনেছেন জীবন এবং যাপনের মধ্যেও যে শৈল্পিক সৃষ্টিশীলতা বিরাজমান তা। দেখিয়েছেন প্রকৃত ভারতবর্ষের চিত্রাবলীকে। সকলের মধ্যেই যে কোন না কোন সৃষ্টিশীলতা রয়েছে, সে ছোট কিংবা বড় যাই হোক না কেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি জীবনের মূল্যকে গল্পগুলিতে প্রস্ফুটিত করেছেন। এক প্রাণের মূল্য যে অন্য প্রাণের কাছে সীমাহীন তা চরিত্রদের উপলব্ধির মাধ্যমে বের করে এনেছেন।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় নিজে কর্মজীবনে ছিলেন একজন মহকুমাশাসক। বাস্তবকে তিনি প্রত্যক্ষে স্বচক্ষে দেখেছেন ও কর্মজীবনে তাঁকে অনেক বাস্তব গরিবদুঃখী মানুষের নানা সমস্যায় পাশে থেকে সাহায্য করতে হয়েছে। নদীয়ার কল্যানী মহকুমায় তাঁর অবস্থানকালে টাউন রেল চালু হলে, বস্তি উচ্ছেদ নাগরিকদের পুনর্বাসনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এভাবে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন এবং তার থেকে অতিক্রান্ত হয়েছেন। এরকম কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা, প্রশাসনিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিদ্বেষমূলক আচরণ, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের শোষণ, অমানবিকতার কথা তাঁর কিছু ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে। সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সুখদুঃখের সমব্যথী হয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় মানুষের পাশে থেকেছেন ও তাকে শিল্পরূপের মাধ্যমে সকলের সামনে এনেছেন, তার মধ্য দিয়ে পাঠক সমাজও শৈল্পিক রস তথা সুখ দুঃখের সঙ্গী হয়েছেন। এভাবেই তিনি সমকালের থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে। প্রান্তজনের হয়ে তিনি কলম ধরেছিলেন তাই তাঁর ছোটগল্পগুলিতে উঠে এসেছে শিকড় থেকে উঠে আসা আটপৌরে লৌকিক মানুষের জীবনবৃত্ত। যাদের পায়ের নীচে মাটি নেই বাসস্থানের ভূমিটুকুও পরের কিন্তু তারা তাদের নিজস্বতায় নিজেরা ভাস্বর। তাদের সকলেরই রয়েছে নিজ নিজ জাতিসত্তা তথা নিজের কর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং জীবনের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাভরা ভালোবাসা। নিম্নবৃত্ত মুচি, মেথর, বাদ্যকর, সাপুড়ে, যাত্রা দলের গাইয়ে, জল্লাদ, ভিখিরি, ডোম বিভিন্ন নিম্নবৃত্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন তাঁর ছোটোগল্পের নায়ক। তাদের রুদ্ধ জীবন সঙ্গীত এবং দৈন্দন্দিন জীবনের কথাকে বলতে গিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রকৃতির অকৃত্রিমতার সঙ্গে এই মানুষগুলির জীবনকে মিলিয়ে দিয়ে বিস্তৃত এক সীমাহীন উদার উন্মুক্ত আকাশকে দেখিয়েছেন।

যেখানে সকলেই রাজার বেশে নিজ নিজ সাম্রাজ্যের অধিকারী। কেউ কোথাও নিঃস্ব বা রিক্ত নয়। যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের মতই, 'আমারা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে'।

তথ্যসূত্র:

১। মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, ১৮এ তেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৪, পৃ. ৭।
২। তদেব, পৃ. ৮।
৩। তদেব, পৃ. ৮।
৪। তদেব, পৃ. ১৪।
৫। তদেব, পৃ. ১৯।
৬। তদেব, পৃ. ২৪।
৭। তদেব, পৃ. ৩২।
৮। তদেব, পৃ. ২৮।
৯। তদেব, পৃ. ৩৫।
১০। তদেব, পৃ. ৪৭।
১১। তদেব, পৃ. ৬৭।
১২। তদেব, পৃ. ৬৮।
১৩। তদেব, পৃ. ৫৯।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, ১৮এ তেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৪।
২। হোসেন, সোহারাব, 'বাংলা ছোটগল্প: তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি' (১ম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ২০১০।
৩। দত্ত, বীরেন্দ্র, 'বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (প্রথম খণ্ড), পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৫।
৪। বিশী, শ্রীপ্রমথনাথ, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬১, চতুর্দশ মুদ্রণ আষাঢ় ১৪২০।
৫। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা' (বাংলা ছোটোগল্পের একশ' বিশ বছর/ ১৮৯১-২০১০), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯১২, পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৬।

৬। দাশ, শিশিরকুমার, 'বাংলা ছোটোগল্প' (১৮৭৩-১৯২৩), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ আগস্ট ২০১২।

৭। ভট্টাচার্য, সুখেন্দ্র, 'ছোটগল্পের পর্ব-পর্বান্তর', প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-৭০০০০২, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯।

৮। ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায় পার্থ (সম্পাদনা),' নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮।

৯। হোসেন, সহারাব, 'বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্য জীবন', করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৪।

১০। চৌধুরী, শ্রীভুদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প গল্পকার', মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, নববর্ষ ১৩৭২।

১১। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, 'সাহিত্যে ছোটোগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, সপ্তম মুদ্রণ পৌষ ১৪২৩।

১২। পাল, ড. শ্রাবণী, 'বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক', অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৮ ।

১৩। রায়, অলোক, ছোটগল্পে স্বদেশ স্বজন, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ ৮ মে ২০১০।

১৪। হোসেন, সোহারাব, 'বাংলা ছোটগল্প: তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি' (২য় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১০।

১৫। হোসেন সোহারাব, 'বাংলা ছোটগল্প: তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি' (৩য় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪।